প্রকাশক : শ্রীজানকীনাথ বসু
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১নং শংকর ঘোষ লেন। কলকাতা-৬

প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬

মুদ্রাকর : শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট
কলকাতা-৬

উৎসর্গ

আমার অত্যন্ত আদরের তিনকন্যা

মণিকা, কুমকুম ও চন্দ্রাকে

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই পুস্তকে প্রকাশিত কবিতাগুলি পড়লেই বেশ বোঝা যাবে যে এগুলি আমার জীবনের বিভিন্ন সময়ের লেখা, কোনটি জীবনের ছাত্রাবস্থায় কোনটি যৌবনে আবার কোনটি পরিণত বয়সে। কিছু কবিতা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে একথা কখনও চিন্তা করিনি এবং তা' সম্ভবও হত না যদি আমার অকৃত্রিম বন্ধু ভ্রাতৃপ্রতিম সাহিত্যসেবী শ্রী অমিয় কুমার ঘোষ আমার পুরাতন খাতা ও ডায়েরী থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কবিতাগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশনার সবরকম দায়িত্ব গ্রহণ না করতেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

আমার 'সব পেয়েছির আসরের' সহকর্মী ও উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় "দাদাভাই" অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পুস্তকের প্রতিটি কবিতা অসীম ধৈর্য সহকারে পাঠ করে বইটির 'মুখবন্ধে' সেগুলির যথাযথ ভাবরূপ বর্ণনা করে পাঠক সমাজের কাছে যেভাবে আকর্ষণীয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন তা অনবদ্য। শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর ঋণ শোধ করা যায় না।

আর যাঁরা আমার লেখা কবিতা ও প্রবন্ধ পড়তে ভালবাসতেন ভালোবাসেন এবং প্রকাশনার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রয়াত অধ্যাপক গোষ্ঠবিহারী সাহা, ডাঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রয়াত কবি করবীবরণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যসেবী রামানন্দ সেন, অভয় মিত্র, গণেশ সাহা, ডঃ ঝুলন সেন, রাগেশ্রী কয়াল প্রমুখ কয়েকজনের নাম আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। এঁদের কাছেও আমি ঋণী।

কবিতা কল্পনালতা। কখন কবিতা তার লতাগুল্ম বিস্তার করে পুষ্পে শোভিত এক দিব্যকানন হবে, তার কোনো সন্ধান হদিস কেউ দিতে পারে না। কবি তার মনের মাধুরী মিশিয়ে অধরা ভাবাকে লেখনীর মধ্যে ধরে আনার, ছুঁয়ে ফেলার নেশায় নিমগ্ন থাকেন, আর একের পর এক নিত্যনব ভাবনাদীপ্ত কল্পনামন্ডিত ভাবসম্পৃক্ত চিত্রদ্যোতিত কবিতাগুচ্ছ সৃজিত হয়ে চলে। তারপর একদিন নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলেন এই তো আমার কবিতা। সেই তো আমার কবিতা।

কবি এমনি করেই নিজের আসন করে নেন কবিতাকাননে। আমাদের পল্লীপরিধির প্রান্তে এক প্রবীণ কবির নবীন কবিতা কাননের খোঁজ পেলাম সেদিন। মুহূর্তেই মুগ্ধ হয়েছি। প্রতিটি পত্রের প্রতিটি পল্লবের কোমল দলের বর্ণে সুবাসে বিন্যাসে চিত্ত মোহিত হয়েছে। আগ্রহ নিয়ে আস্বাদ করতে করতে এগিয়েছি আর সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথের খাতার ভিতর দিয়ে সেই কবিতার সৃজয়িতা, কল্পনালতার কানন কুসুমের মালাকর রূপে মজুমদার মশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল।

গুচ্ছে বিন্যস্ত ক্ষুদ্র, নাতিক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, নাতিদীর্ঘ বিচিত্র রচনার সৌকর্যে গ্রন্থটি পূর্ণ হয়ে উঠবে এই বিশ্বাস নিয়ে লেখার সূচনা করলাম। বর্ণমালাকে সূচক করে শ্যামাবিষয়ক কবিতাটি চমৎকৃত করে। আবার অনুকারধ্বনি সূচক অব্যয় শব্দকে অবলম্বন করে চিংড়ি কিংবা ফড়িং অথবা কবিতাকে নিজের প্রেয়সীর নাম বলে ঘোষণা করার মধ্যে যে সপ্রতিভতা আছে ভোলানাথের, একজন নগণ্য পাঠক হিসাবে তার তারিফ করবই। ওদিকে দেখি ছড়ার ভঙ্গীতে পূজোবাড়ী, সরষের ভেতর ভূত বেশ মজার রোশনাই ছড়িয়ে দিচ্ছে। সাবাস না বলে উপায় নেই। ঋতুচক্রের তরঙ্গে বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত কিছুই বাদ যায়নি। শেষ ইচ্ছা কিংবা আবার আসিব ফিরে এপিট্যাফ নয় তো! নানা ভাব ভাবনায় ভাসতে ভাসতে কবিতার পূর্ণতা যখন কবি মনকে দ্রুত করেছে তখনই ভোলানাথের লেখনী থেকে মন কালি আর হাত একত্রিত হয়ে মোক্ষম চরণটি নির্গলিত করে নিয়ে এসেছে। তবু সেই মোর কবিতা যে হৃদয়ের বিলাপ আর চেতনার সন্তাপ হয়ে ঝরে পড়ছে কবিতার নির্ঝরিণী হয়ে

সেইখানেই সার্থকতা কবির, ভোলানাথ মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতাটিই তাই এই কবিতাগ্রন্থের শিরোনাম।

সুখপাঠ্য, সহজবোধ্য, স্বাভাবিক, স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণীয় সম্পাদনীয় এমন বেশ কিছু কবিতা এই পুস্তকের মধ্যে উপহার দিয়েছেন ভোলনাথ মজুমদার। একদিন মাখলাতে সব পেয়েছির আসরের গঠন, প্রসার ও পরিচালনার ব্যাপারে ভোলাদার খুবই উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল মনে পড়ে; সেই সময়ে এই লেখকের সঙ্গে তার গভীর যোগাযোগ ছিল। তারপর বন্ধুত্বের সেতু অটুট রেখে আজ দুজনেই অষ্টদশকের সন্নিকটবর্তী হয়েছি, তাই প্রবীণ এই ভোলাদার নবীন সৃজনী শক্তির সঙ্গে আবার পরিচিত হয়ে দুকথা লেখবার সৌভাগ্য পেয়ে কিছু প্রগল্‌ভতা করে ফেললাম। আমার এই লেখাটা না পড়লেও সবাই কিন্তু ভোলানাথ মজুমদারের লেখাগুলি পড়বেন, দেখবেন ভোলানাথকে আর ভোলা যাবে না।

সূচীপত্র ঃ

আধুনিক ঃ

ছোটদের মজার ছড়া ও কবিতা ঃ

বরণীয় ঃ

ঋতুরঙ্গ

ভক্তিগীতি ঃ

আধুনিক

এসেছিলে তোমরা

এসেছিলে তোমরা
দাবী নিয়ে একটা ছোট্ট কবিতার,
(আধুনিক হলে ভাল হয়)
কিম্বা কোন পাকা লেখা।
কিন্তু কি দেবো
কোনটাই জানা নেই আমার
অথবা শিখিনি।
তবু নাছোড় বান্দা, কিছু দিতে হবে
সাদা কাগজে কালির আঁচড়
বস্তু না হোক বাস্তব কিছু।
যা আছে তা ফুলের কথা, পাখীর কথা
অথবা প্রকৃতির
অতি পুরাতন
ভাবছন্দ মিলের ঠাসাঠাসি।
নেই কোন অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ
কিম্বা আধুনিকতা
শুধুই কবিতা।
তাই তোমাদের কথাই তোমাদের লিখে পাঠালাম
সবটুকু বাস্তব
যেমন বাস্তব 'এসেছিলে তোমরা'।

অভিমান

আমার স্বভাবের একটা ত্রুটি
অনেকটা নেশার মতন,
অধিক রাতে কলকাতায়
খুঁজে ফেরা
আমার গল্পের উপকরণ।
ঘরে ফেরা মাঝ রাতে
কখনও তারও পরে
ছকে বাঁধা জীবন।
অনুনয় আস্ফালন
প্রতিজ্ঞা ভূরি ভূরি
বারবার হয়েছে নিষ্ফল,
ট্রাডিশন হয়নি হেরফের।
সেদিনের ফেরাও ছিল
প্রাত্যহিক নিয়মে।
সদর থেকে অন্দরে
সব কটা দরজা খোলা ছিল
হাট করে,
টেবিলে রাতের খাবার
পরিপাটি করে রাখা,
সযত্নে ভাঁজ করে রাখা
চিরকুট একখানা
জলের গ্লাস ঢাকা —
'খোঁজ কোরোনা মুক্তি দিলাম'

অভিমান! হয়ত জমেছিল
তিল তিল করে,
গল্পের উপকরণ
শেষে মিলল নিজেরই ঘরে।
প্যাডের কাগজ নিয়ে
লিখতে বসলাম
মনে নেই গল্প না কবিতা
কোনটাই মনোমত হল না তা।
যা লিখলাম ছিঁড়লাম
এক এক করে
কাগজে কাগজে ঘর গেল ভরে।
ঘুম ভাঙ্গল অফিসের
সময় পার করে।
ঝক্‌ঝকে মোজায়েক
জানালায় উপচে পড়া রোদ
জ্বালাধরা চোখ
প্যাডের সাদা কাগজে বিদ্রূপ
সেখানে নেই কোন কালির আঁচড়

যুগান্তর

মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল, আজও যাচ্ছে
কত ঝড় ঝঞ্ঝা গোলা বারুদ প্রতিনিয়ত।
চলছে ধর্মের নামে মারামারি হানাহানি
জাতির নামে দেশ বিভাগ
গোষ্ঠীর স্বার্থে লুণ্ঠন ধর্ষণ অপহরণ।
পরাভূত মানুষের প্রেম মানুষের বিবেক।
স্রষ্টা যোগনিদ্রায় নিদ্রিত।
মাতা বসুমতী ধ্যানমগ্ন।
বাসুকী! এখনও কেন স্পন্দনহীন নিশ্চল
স্নেহময়ী জননীর মত?
নামাও মাথার ভার একটিবার
ঋজু হয়ে বসো
না হলে রজ্জু হয়ে গর্জে ওঠ আর একবার
বিষ নিঃশ্বাসে মন্থিত হোক মহার্ণব।
বিন্ধ্য হিমালয় কারাকোরাম
ডুবে যাক সাগরের অতলে
মানুষ নেমে আসুক একই সমতলে,
সুরু হোক মানুষের জয়যাত্রা
নতুন ভূখন্ডে।
তা যদি না হয়
পরমাণু ক্ষেপণের আগেই
একটা ঝড় উঠুক
মহীরূহের অঙ্গ থেকে খসে পড়ুক আচ্ছাদন
শির থেকে শিরস্ত্রান,
তার গর্বোন্নত শির নুয়ে পড়ুক মাটির শরীরে।
শুধু অক্ষত থাক মরূদ্যান মরুর অন্তরে।
যেখানে সঞ্চিত থাকবে
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তৃণ ও তৃষ্ণার জল।

তবু সেই মোর কবিতা

কবিতা আমারও আছে
যেমন সবার থাকে দেহের প্রতি পরমাণুতে
হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে।
তবে যদি মিল চাও
তোমার কবিতার সঙ্গে
কোনদিন মিলবেনা,
কেননা — আমি প্রেমিকা নই
প্রেমের ব্যাপারী।
আমি বারাঙ্গনা
তোমারই ফসল বুকে নিয়ে
তোমারই অঙ্গনে আমার নিত্য বেচাকেনা।
আমি যে শুনেছি প্রতিনিয়ত
তোমার বেদনাহত, বঞ্চিত
হৃদয়ের ব্যাকুল বিলাপ
অবলুপ্ত চেতনার আকুল সন্তাপ।
নিজে তাই রক্তাক্ত হৃদয়ের দুঃখ লজ্জা গ্লানি
তুচ্ছ মানি
নিষ্পেষিত অধরে প্রতারক হাসি টানি
সিঞ্চিত করেছি শান্তি,
মুক্তি দিতে তোমার অশান্ত হৃদয়ের সর্বগ্লানি ভয়
বারংবার। আমার এ নিষ্ঠুর অভিনয়
হোক ক্ষণিকের, তবু সেই মোর কবিতা
আমার অপরাহত জয়।

সমতা পরিষদের কবি সম্মেলন, ১৯৯৩

মিলনোৎসব

জীবনে অনেক আনন্দ মেলায়
পেয়েছি নিমন্ত্রণ যার অনেকটাই
ছিল মেকী। বাকিটা অতি সাধারণ।
তার কিছু কিছু স্মৃতি টুকিটাকি কথা
যা হাতে গোনা যায় — মাঝে মাঝে
ভেসে ওঠে মনের পর্দায়।
কোনটা কালস্রোতে গেছে ক্ষয়ে —
কিম্বা ফিকে হয়ে গেছে স্মৃতির পাতায়।
সেইসব উৎসবের দিনে —
আলোর রোশনাই,
যন্ত্রসঙ্গীতের মোহজাল,
সুখাদ্যের মাদকতা
চেনা অচেনা স্লীভলেশ বৌদিদের
পালিশ করা ঠোঁটে কোলগেট হাসিটি
নিয়ে উষ্ণ আপ্যায়ণ;
অভাব ছিলনা কিছুই।
মনে হয়েছে তখন —
পেলাম যা' হয়ত তা অমূল্যরতন।
একসময় ভেঙ্গেছে ভুল —
মনেও হয়ত পেয়েছি ব্যথা,
যখন মনের ক্যাসেটে শুনেছি
সেইসব হাসিগান মাপা কথা,
মন বলেছে তা প্রাণহীন আড়ম্বরই নয় শুধু
বিত্তের দাম্ভিকতা আর আনন্দের প্রতিশ্রুতি —
যা ছিল না, তা হৃদয়ের উত্তাপ
কিম্বা আন্তরিকতা।

মিলনের আনন্দযজ্ঞে তাই বার বার
ডাক এলে ছুটে গেছি সেথা
যেথা নেই কোন রোশনাই, দম্ভ অকারণ,
আছে শুধু কথা, হাসি, গান
হাতে হাত প্রাণে প্রাণ,
যেথা বহুদিন পরে পরিচিত আঁখির ভাষায়,
শুনেছি প্রাণের ব্যাকুলতা,
হৃদয়ের স্পন্দন।

উত্তরপাড়া গভঃ হাই স্কুল
পুনর্মিলন উৎসব, ১৯৯৩

আবার আসিব ফিরে

আবার আসিব ফিরে
অঙ্কুরিত হব হিমালয় থেকে মহাসাগরের
বিস্তীর্ণ মাটির বুকে কোনখানে।
খদ্যোৎ হয়ে খুঁজে বেড়াব,
আমার পূর্বসত্ত্বাকে
আর অভিসিক্ত করবো আমার
না পাওয়ার ইচ্ছাদের
যারা যুগ যুগ সংরক্ষিত আছে
আমার হৃদয়ের গোপন প্রকোষ্ঠে
কেন না আমার কাম্য নয় — মোক্ষ অথবা মুক্তি।
মাতৃক্রোড়ই আমার মুক্তাঙ্গন,
আমার প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি।

উত্তরপাড়া,
৭ই ফাল্গুন, ১৪০৪

শেষ ইচ্ছা

শীতের পড়ন্ত বেলা
হঠাৎ নেমে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে
দিগন্ত জুড়ে
কুয়াশার কালো ছায়া
সামনে পিছনে সব পথ অচেনা
দুর্নিবার এক ভয়
আমার রক্ত মাংসের সত্ত্বাকে আঁকড়ে ধরতে চায়
দু হাতে।
হে মহাকাল
বিদ্যুৎ হানো একটিবার
শুধু বলে যাব —
ভালই ছিলাম এখানে
সুখ দুঃখ নিয়ে তোমাদের মাঝে পুরনো আস্তানায়।

'কবিতা নিয়ে'
সমতা পরিষদ কবি সম্মেলন
ডিসেম্বর ১৯৯৬

অভাবের সংসারে

অভাবের সংসারে
যে আসছে আসতে দাও
যদি দেখতে চাও প্রাণোচ্ছল হাসি,
মানুষ হাসতে ভুলে যাচ্ছে।
অভাবের সংসারে —
যে যাচ্ছে যেতে দাও
যদি দুমুঠো খেতে চাও পেট ভরে;
খাদ্য ফুরিয়ে যাচ্ছে।
অভাবের সংসারে
যে থাকতে চায় থাকতে দাও
একটু মমতা আর ভালবাসা দিয়ে
ভালবাসা হারিয়ে যাচ্ছে।
কারণ

প্রাণোচ্ছল হাসি
নির্ভেজাল খাদ্য
খাঁটি ভালবাসা
এইসব ভালভাল কথা
এরপর হয়ত খুঁজে পাবে
শিশুপাঠ্যে কিম্বা অভিধানে।

'আনন্দ'
শারদীয়া ১৪০৪

না বলা কথা

অনেক পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে,
সাগর, মরু পার হয়ে,
আজ এসে দাঁড়িয়েছি জীবনের শেষ সীমানায়।
পিছনে তাকিয়ে জীবনকে মনে হয়েছে
একটি কথামালা।
যে কথাকে ঠিক ঠিক সাজালে
হবেও বা কোন ইতিহাস,
যার শুরু ও শেষ দুইই আমার অজানা।
সেইসব কথাদের কিছু থেকে গেছে অব্যক্ত
যেমন অনেকেরই থাকে জীবনের গোপন লকারে
থরে থরে সাজান।
সেই লকারের চাবি যার হাতে দেওয়া যেত
সমব্যথী একজন,
যে পারত আমার সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার
ভাগ নিতে।
যে পারত আমার না পাওয়া লজ্জাকে
সমবেদনায় ঢেকে দিতে।
তেমন মানুষতো পেলাম না আজীবন।
তাই যাওয়ার আগে
যশ, মান, আত্মীয়, আত্মজ,
তিলে তিলে জমে ওঠা সম্পদ,
সকলই ছেড়ে যেতে হবে একদিন।
তবু পারব কি মুক্তি দিতে সেইসব কথাদের
লালন করেছি যাদের গোপনে এতদিন।

সমতা পরিষদ
২০শে ডিসেম্বর, ১৯৯২

পরিক্রমা

সব চাওয়া চাওয়া নয়
কিছু চাই ভুল করে
তারই ফসল বুকে নিয়ে
ধরায় আসি বারেবারে।
ভুল জেনেও করি ভুল
গনি মাশুল
প্রতিবারে
কৌতূহল ভরে।
বুঝি শেষ নেই এ চাওয়ার
তাই এত যাওয়া· আসা
ভ্রান্তি জেনেও মনে আসে
প্রেম প্রীতি ভালবাসা।
ভালবাসা হোক নগ্ন ভাষাহীন নয়
সংজ্ঞাহীন চিত্রকল্প বিশ্বের বিস্ময়।
প্রেম তবু মানে না পরাজয়।
টানিছে অহরহ বিশ্বে দুর্নিবার টানে
বাঁধিয়া রাখিতে চায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে।
তবে কি মুক্তি নেই এই যাওয়া আসার
রহিবে কি অব্যাহত এ পথ পরিক্রমা?
দুরূহ এ জিজ্ঞাসার কে দেবে উত্তর?
শুনিনু অকস্মাৎ অন্তরে
বিশ্বের শাশ্বত বাণী সংক্ষিপ্ত উত্তর
'সমর্পণ কর'।

কবি সম্মেলন

পাড়ার 'সবুজ সংঘ' ক্লাবে
কবি সম্মেলন,
জনৈক প্রখ্যাত কবি
অলঙ্কৃত করবেন প্রধান অতিথির আসন।
এ অভাজনও নিমন্ত্রিত
তবে অতিথি হিসাবে নয়
কবিতা পাঠের জন্য — আধুনিক ও স্বরচিত।
পাড়ার দেওয়াল পত্রিকায়
ক'একটা ব্যঙ্গ কবিতা লেখার দৌলতে
এ অভাজনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল
পাড়ায়-বেপাড়ায়।
পাড়ার কচিকাঁচার দল আমায় দেখলেই
ব্যঙ্গ করে কবি বলে ডাকে অলক্ষ্যে।
তারাই কিন্তু আমার প্রচার মাধ্যম।
লেখাতো দূরের কথা
আধুনিক কবিতা কোনদিন ঠিকঠাক বুঝি না।
তাই আসর শুরুর পূর্বেই চিন্তাগ্রস্ত আমি
জরীপ করে বুঝলাম —
উদ্যোক্তা বা শ্রোতাদের বেশীটাই
কবি কিম্বা কবিতা প্রেমিক নয়।
সেই ভরসায় ওদের ডেকে কবিতা শোনালাম
আসরের পূর্বে জনান্তিকে।
ওরা শুনে বললে সমস্বরে
'ওটা কবিতাই নয়, চলবে না এ আসরে।'
বললাম — তোমাদের প্রধান অতিথির লেখা সদ্য প্রকাশিত।
ওদের চোখে সংশয়।
আমি প্রত্যাগত।

শিল্পী

দিন শেষ। রাত্রি সমাগত।
তমসার তীরে শিল্পী ধ্যানমগ্ন শান্ত সমাহিত।
আপনার সৃষ্টির আনন্দে বিভোর,
উল্লসিত প্রাণ।
অনীহা বৈদিক মন্ত্রে,
ভুলে যায় আরাত্রিক গান।
ভুলে যায় ধূপ দীপে; মালায় চন্দনে,
ঘন্টা কাঁসরে
দেবতাকে জানাতে প্রণাম।
প্রজ্ঞা তার —
নিস্প্রাণ পাথরের বুকে মাথা ঠুকে
জাহ্নবীর পুতবারি সিঞ্চনে
প্রাণপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ আয়োজন
প্রহসন নয় শুধু অলীক স্বপন।
প্রকৃতিতে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি
যুগ যুগ ধরে ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মত্ত
বিরাট এক শিশুর অস্তিত্ব।
তার স্বভাবের পাথরে চিহ্নিত হয়
স্রষ্টার বিচিত্র রূপ প্রতিনিয়ত।
তারপর .....
সেথা বিকশিত হয় পুণ্য লগ্নে কোনদিন
সহস্রদল একটি কমল নিজস্ব মহিমায়;
সম্পূর্ণ হয় তার সাধনা কঠিন।

'শ্রীমা সারদা'
অগ্রহায়ণ, ১৪০৩

চিরসুন্দর

বন্যেরা বনে সুন্দর
শিশু মায়ের কোলে,
বৃক্ষ ফলে সুন্দর
লতা পুষ্পিত হলে।
শাওনে বরষা সুন্দর
বিদ্যুৎ মেঘের কোলে,
ভাদরে নদী সুন্দর
পাহাড়ে ঢল্ নামলে।
অম্বর নীলে সুন্দর
ধরণী শ্যামল হোলে;
উদয়ে ভানু সুন্দর
শশী নীলের কোলে।
শিশুর হাসি সুন্দর
কেকা পাখা মেললে,
সঙ্গীত সুরে সুন্দর
নৃত্য ছন্দ তালে।
নারী যৌবনে সুন্দর
মানুষ বৃদ্ধ হোলে,
জীবন প্রজ্ঞায় সুন্দর
মৃত্যু অশ্রুজলে।

উত্তরপাড়া গভঃ হাই স্কুল
পুনর্মিলন উৎসব ১৯৯৪

গণসঙ্গীত

অমানিশা বুঝি শেষ হোল ঐ
পূবাকাশ হোল রক্তিম,
মিছিলের হাতে পতাকা রঙিন
জাগে নব যুগ নূতন দিন।
জনতা ডাকিছে ওঠ সবে আজ
পথে নেমে এস ছেড়ে ভয় লাজ
তোল স্লোগান —
ভারতবাসী সবে এক জাতি
বিদ্বেষ ত্যাজো আনো সংহতি
ধর্মের নামে যত জালিয়াতি
ভেঙ্গে করো খান খান।
সাদা কালো আর বামুন শূদ্র
শিখ-পাঠান-নাগা-হিন্দু-বৌদ্ধ
কেহ নয় ছোট সকলে মানুষ
হোক সে মুসলমান।
একই মাটিতে জন্ম সবার,
একই মেঘ সবে দেয় জলধার
একই রবি শশী দেয় সবে আলো
একই বাতাস জুড়ায় প্রাণ।
এস এস সবে আর আছো যারা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
জাতপাত ভুলে এক প্রাণ হয়ে
হও সবে আগুয়ান,
জনতা কণ্ঠে ধ্বনিত হোক
মানুষের জয়গান।

প্রবাসী সংঘ
বিশেষ সংখ্যা ১৪০২
আশ্বিন

ছোটদের ছড়া ও কবিতা

মিনি ছড়া

(১)

কালি কলম মন
লেখে তিন জন,
হাত বলে আমি বাদ
পড়িনু কি কারণ।

(২)

ঘড়ি সারাদিন রাত
বলে টিক্ টিক্ টিক্
সময়ে সময়ের কাজ
করে যাও ঠিক।

(৩)

ঢিলে ঢালা পোষাক ভাল
কাজে ঢিলে ভাল নয়
মিলেমিশে থাকা ভাল
(তবে) অসতের সঙ্গে নয়।

(৪)

চঞ্চল চিত্ত রয় যার নিত্য,
কোন কাজে মন যার রয় না
খাওয়া পরা সুখ যার, দিবা নিদ্রা সখ যার
ধরায় সে কোন কাজে আসে না।

(৫)

'টাকা মাটি মাটি টাকা'
টাকায় মাটি মাটিতে টাকা
যার আছে তার সব আছে
যার নেই তার সব ফাঁকা।

রিম্ ঝিম্ বৃষ্টি

রিম্ ঝিম্ বৃষ্টি
সারাদিন মেঘলা,
ঝোড়ো হাওয়া বইছে
জল কাদা বাদলা।
মাতাল নদী মাতলা
মাছ ধরবে ন্যাপলা
মাথায় টোকা বেরিয়ে পড়ে
সঙ্গী হাবুল ক্যাবলা।
ওস্তাদ ন্যাপলা
ঘুরিয়ে মাথায় মাঝ গাঙ্গেতে
ফেলল জাল খ্যাপলা।
পাড়ে ছিল শ্যাওলা
ঝাপটা লেগে পা পিছলে
পড়ল জলে হাব্‌লা।
জাল গেল ফেঁসে
হাব্‌লা মল কেশে
ফোকর গলে পালাল সব
রুই পোনা আর কাতলা।
ক্যাবলা ছিল আড়ে
জাল তুলল পাড়ে
জাল ঝেড়ে, হাবলা ছাড়াও
মিলল শামুক শাপলা।

শিব ঠাকুরের বিয়ে

ধিন ধিন ধিনা
নাচে চিংড়ি পোনা
জলে ভরা খাল বিল
পুকুর ডোবা খানা।
ব্যাঙ বাবাজী বাজায় সানাই
গান ধরেছে মেছো কানাই
নন্দী বাজায় সিঙ্গা
শিবঠাকুরের বিয়ে আজ
তাইরে নাইরে না।
জবর ফলার আজকে সবার
দুধ দই ক্ষীর ছানা,
ধিনতা তাধিন ধিনা।

খোকার পড়া

পিড়িং পিড়িং পিড়িং
উই চিংড়ি বাজায় সেতার
নাচে গঙ্গা ফড়িং
ঝিঁঝির পায়ে ঝাঁজর বাজে
লাফায় বল্লা হরিণ।
তাই না দেখে ন্যাংটো খোকা
পড়ছে বসে রিডিং
কেউ বোঝে না মিনিং।

চাঁদা মামা

চাঁদামামা দেয় হামা
দাঁত নেই ফোক্‌লা।
দিনে ঘুমায় মায়ের কোলে
রাতে ঘোরে একলা।
চাঁদা মামা নেমে আসে
মেঘের দোলায় ভেসে,
খোকার কপালে টি দিয়ে
ফেরে আপন দেশে।
চাঁদা মামা সবার প্রিয়
হাসিটি মধুর,
চিরদিনের বন্ধু সে যে
সব খোকা খুকুর।

বর্তমান প্রজন্ম

ছড়া শিখেছি এক
শোননি ত দাদু,
পড়লেই পাবে মজা
মনে হবে যাদু।
তবে তোমরা বুঝবে না ঠিক
অর্থ বড় কঠিন,
বুঝতে ভাব অর্থ তার
কেটে যাবে দিন।
নেই পক্ষীরাজ ঘোড়া
তেপান্তরের মাঠ,
নেই কোন রাজপুত্তুর
বৌ ঠাকুরাণীর হাট।
নেই সোনার পালঙ্কে শোয়া
ঘুমন্ত রাজকন্যা,
নেই দৈত্যদানো কিম্বা
কথা বলা ব্যাঙ্গমা।
ওরা হয়ত সবাই ছিল
ঠাকুর রবির কালে,
শিশুদেরও প্রশ্ন এখন —
'ওরা ছিল কি আসলে?'
এখন ছেলে ভোলান ছড়ায়
ওদের মন ভোলানো দায়,
খেলনা রকেট চড়ে ওরা
চাঁদে যেতে চায়।

বরষার ছড়া

জল পড়ে পাতা নড়ে
মেঘ জমেছে আকাশ জুড়ে।
হাতী চলে মাথা নড়ে
দুলে দুলে খোকন পড়ে।
ঘুরছে মেছো ডোঙ্গায় চড়ে
ঝিমোয় টিয়া বসে দাঁড়ে।
ভাঙ্গল পা কেউ পিছলে পড়ে
ঘড়ি ঘড়ি জোয়ার বাড়ে।
ধানের শিশু মাথা নাড়ে
ব্যাঙ ডাকছে পুকুর পাড়ে।
ইঁদুর পালায় গর্ত ছেড়ে
বিজলী হানে মেঘের আড়ে।
পাশের বাড়ীর রান্নাঘরে
ইলিশ ভাজার সুবাস ছাড়ে।
হাসছে খুকু আড়ে আড়ে
দাদু ঘোড়ার পিঠে চড়ে।
গান জুড়েছে ভুবন পাঁড়ে
বুড়োরা খেলে দাবা বোড়ে।
কড়কড়িয়ে বাজ পড়ে
ঝুলছে ডালে একানড়ে।
ছোট্ট খোকা, ভয়ে ডরে
কোলটিতে মা'র লুকিয়ে পড়ে।

পূজোর ছড়া

পূজো মানেই সাজা গোজা
চপ কাটলেট খাওয়া,
পূজো মানেই পড়া বন্ধ
দেশ বিদেশে যাওয়া।
পূজো মানেই সারা দুপুর
টো টো করে ঘোরা,
তাস দাবা আর লুডো খেলে
সময়টা পার করা।
পূজো মানেই নীল আকাশে
সাদা মেঘের ভেলা,
পূজো মানেই ঠাকুর দেখা
সকাল সন্ধ্যে বেলা।
পূজো মানেই স্বাধীনতা
অবাধ মেলা মেশা
পূজো মানেই হাসি কৌতুক
গল্প করার নেশা।
পূজো মানেই মায়ের আদর
বাবার ভালোবাসা
পূজো মানেই 'মা' পড়লে জলে
চোখের জলে ভাসা।

পূজোবাড়ী

বছরের পূজোসংখ্যা যত
এলো পূজোবাড়ীতে,
খোকাবাবু রান্নাঘরে কাঠি দেয় হাঁড়িতে।
হাঁড়িতে ফুটছে জল টগবগ টগবগ
খোকাকে সরাও আগে কোরোনাকো বকবক।
চাল ঢেলে দাও আগে কোরোনাকো দেরী
পোলাও হবে আধমণ সেইমত তরকারী।
মাছ হবে মণটাক, ডাল দশ কেজী,
চাটনী পাঁপড় ভাজা থাকবে ভাজাভূজি
মিষ্টিতো থাকবেই পাঁচ রকমের।
দই ক্ষীর রাবড়ি সব দশ সের।
অতিথি ঠেকাও গিয়ে ভীড়ে ভীড় বাড়ি,
সকাল থেকে আসার শুরু বাইক মোটরগাড়ী।
ভোর না হ'তে বাজছে ঢাক সঙ্গে সানাই
বাজাচ্ছে ঢোল চিন্তামনি নাচছে কানাই।
গয়না শাড়ী রংবেরংএর
ম্যাক্সি মিনি কত ঢংএর
হাসি খুশীর ঝড় বয়ে যায়
নেই কোন বন্ধন,
মা এসেছে বাপের বাড়ী —
আজকে মায়ের বোধন।

মায়ের মন

খোকা মাকে শুধায় ডেকে
বুকের পরে মাথা রেখে —
আকাশের তারারা কি
গাছের পরে নেমে এসে
হয় কি মা জোনাকি?
খোকার গালে দিয়ে চুমা
মা কয় হেসে —
চাঁদামামা মাটির পরে নেমে এসে
দেয় হামা,
সেকি আমার খোকাটি?
যখন থাকে জেগে
এই ধরনের হাজার প্রশ্ন
শুধায় খোকা মাকে।
উত্তর ঠিক খুঁজতে মায়ের
আকাশ পাতাল ভেবে
কপাল ওঠে ঘেমে।
তাইতো খোকা
যখন থাকে ঘুমে
চাঁদপানা মুখ করে
চোখ দুটি মা'র
আটকে থাকে ত্রাসে
খোকার মুখের পরে।

জাগে বুকে শতেক আশা মা'র
নিরাশা কখন
দুঃখ সুখের ঢেউ
দোলা দেয় বুকে
ভেজে দু নয়ন।
প্রশ্ন জাগে মনে অকারণ —
খোকা আমার এলো কোথা থেকে
এত বুদ্ধি পেলই বা কি করে?
শঙ্কিত হয় মন,
এইটুকু এই ছোট্ট আমার বুকে
কেমন করে রাখব ওকে ধরে
আজীবন।

সরষের ভেতর ভূত

(১)

দুই ভূত পালোয়ান
নাকি সুরে গান গায় কোরাসে।
সন্ধ্যা নামলেই পথ ঘাট শুন্‌সান্।
পথিক যত সব দেয় ছুট তরাসে।
ভুল করে যায় যারা
ফেরীওলা ব্যাপারী এ পথে
ক্কচিৎ সাঁজে কিম্বা রাতে
শোনে প্রতিজনে —
কোথা থেকে খনখনে গলা তারে ধমকায়,
না দেখে মানুষটা পিলে তার চমকায়।
রাম নাম মুখে বলে
মাথার বোঝা ফেলে
ছুট দেয় কোথা সে
জানে নাকো নিজে সে।
পরদিন দিনমানে
স্বজন বন্ধুসনে এসে দ্যাখে —
জায়গাটা থমথমে
মোট ঘাঠ ভূতপ্রেত নেই কেউ সেখানে।
পুলিশ গুনিন্ যত ওঝা টিক্‌টিকি
শুনেছে বহুবার কেসটা
করেছেও বহুবার ধরবার চেষ্টা।
ফল কিছু ফলেনি,
ভূতধরা দূরে থাক
ভূতেদের টিকিটিরও দর্শন মেলেনি।

(২)

এমন সময় এলো গ্রামে এক চৌকিদার
রামরূপ পাশোয়ান,
নীল কুর্তা গায়ে, কাঁধে মোটা আলোয়ান।
ভয় ডর কাকে বলে জানে না।
ভুত প্রেত মানে না।
সব শুনে বলে সে
ভুতপ্রেত চোর ডাকু গাঁট কাটা যেই হোক,
জব্দ সে করবে।
হাতে এক গাছা লাঠি শুধু থাকলেই চলবে।
পরদিন সন্ধ্যার কিছু পরে
পাশোয়ান গেল ঠিক সেখানে একলা,
যেখানে ঘটে প্রায়ই কেস্‌টা।
সাপভরা দুটো ঝাঁপি ভরে নিল ঝোলাটায়
বদল করে নিল আপনার বেশটা।
রাত প্রায় দশটা —
ঠিক্‌ঠাক্ জায়গায় পৌঁছাল পাশোয়ান।
নাকি সুরে গান শুনে ফেলে থুয়ে ঝোলাটা
চম্পট দিল সোজা শেষটা।
পরদিন সকালে
গাঁয়ের যত লোক দেখল সবাই —
সাপের ছোবলে
পড়ে আছে ভূতলে
সংজ্ঞাহীন দুটো গ্রামের সেপাই।
আরও সেথা পড়ে আছে ঝাঁপি আর ঝোলাটা।
কালো দুটো বোরখায় ভূত আঁকা বেশটা।

কবিতা

কবিতা লেখে পাগলে।
পপিতা খায় ছাগলে
আমার প্রেয়সীর নাম কবিতা।
জানতে চাও কি ঠিকানা?
পূবের বামুন পাড়ায়
রাস্তার নাম নেই জানা।
গলিটা সরু একমুখো
বলতে পার আধকানা,
তারি শেষ মাথায় বাড়ি
আটখানা ঘর একটানা।
দেখতে কেমন জানতে চাও?
তার গড়ন খাটো মিশকালো
হাসিটি মিষ্টি বড় ভালো।
মেধা নেইকো মেদবহুল
কথায় কথায় ফোটায় হুল।
গলায় গমক চলায় ঠমক হরিণ-নয়না,
পরীও তাকে বলতে পার তবে তার নেই ডানা।
বব ছাঁট এক মাথা চুল
মুখে হাসির ঝরনা
নাচ গানে তার নেই সমতুল
প্রিয়া আমার বহুগুণা।
রূপের গর্বে গরিবনী, আছে হরেক বায়না
কাছে যেতে তার বড় ভয় পাই
তবুও না গিয়ে পারিনা।
দেখতে তাকে যদি মন চায়
যাওনা কেন নামখানা।

ছড়ার কবি অসি রায়কে

অসি রায়ের কবিতা
খেলুম করে পান্‌তা,
মন্দ কি আর লাগল
সময়টাত কাটল
জ্ঞানও কিছু বাড়ল।
পড়ে গেলাম গড়গড়িয়ে
পাড়া পড়শি জানল
মুচকি হাসি হাসল
কেউবা হাসি চাপতে গিয়ে
বিষম খেয়ে কাশল
অসি রায়ের ‘ছড়াছড়ি’
ঘুরছে পাড়ার বাড়ী বাড়ী
যেন মশলা মাখা ঝালমুড়ি
শুনল পাড়ার ছোঁড়া ছুঁড়ি
হেসে খেল গড়াগড়ি
কেউ বা মুখ বেঁকিয়ে
বলল বুড়োর বাড়াবাড়ি।
ফোকলা দাঁতে খুশীর হাসি
হাসল শুনে বুড়ো বুড়ি
কচিকাচা ডজন খানেক
শুনে অসির ‘ছড়াছড়ি’
বুঝল কি তা’ তারাই জানে
খুশিতে ডগমগিয়ে
খেলে ধূলায় গড়াগড়ি।

লিখে দিলাম ছড়ার খবর
ছিল যা তা' আমার ঝোলায়
প্রশংসা না নিন্দে সেটা
বোঝা তোমার নিজেরঃ দায়।

আনন্দ,
আশ্বিন, ১৪০৫

কবি বন্দনা

ভারতের মহাকাশ উদ্ভাসিত করি
হে জ্যোতির্ময়,
বারশ সাতষট্টির পঁচিশে বৈশাখ
হয়েছিল তোমার উদয়।
তুমি ভরেছিলে মঙ্গলঘট
বিশ্ববাসীর সাথে,
সাম্যবাদের জয়গান তুমি
প্রচারিলে সংগীতে।
শুনালে প্রেমের মধূর সে বাণী
সারা বিশ্বের কানে,
টানিলে সবারে ভারতের বুকে
মানব মিলন গানে।
ভক্তি প্রেমের সুমধুর ভাষে
পূর্ণ করিয়া ডালি,
নিবেদিলে স্রষ্টার শ্রীচরণে
পবিত্র গীতাঞ্জলি।
সেই ছবি হেরি মোহিত হইল
ছিল যত গুণীজন,
দেশ বিদেশের দরবারে তব
আসিল নিমন্ত্রণ।

শ্রেষ্ঠ আসনে বসালে তোমায়
গলে দিল মণিহার,
উজ্জ্বল হ'ল ভারতের মুখ
বুক ভরে গেল মা'র।
শৃঙ্খলিত মাতৃমূর্তি
পরাধীনতার গ্লানি,
জ্বেলেছিল তব দরদী হৃদয়ে
বিপ্লবের দাবাগ্নি।
স্ফুরিত হ'ল লেখনী মুখে
বজ্র কঠিন ভাষা,
দীক্ষা দিলে মাতৃমন্ত্রে
জাগালে তরুণপ্রাণে আশা।
হেরি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যালীলা
শিশুনারী নির্বিশেষে
শাসকের দেওয়া 'নাইট' উপাধি
ত্যজিলে ঘৃণায় রোষে।
বাংলা ভাষার জ্ঞানপীঠ
শিশু সাধকের তপোবন,
রচনা করিলে প্রকৃতির কোলে
শান্তি নিকেতন।
ভারতীয় মতে নব আঙ্গিকে
করি শিক্ষা প্রবর্তন,
শিক্ষা জগতে জ্ঞানের দুয়ার
করিলে উদ্‌ঘাটন।
তুমি চলে গেছ ইহলোক ছাড়ি
হে বিশ্ববরেণ্য,
তোমার আসন আজিও শূন্য
হে বীর করহে পূর্ণ।

সুরসাধক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে

(স্মৃতি সভায় পঠিত)

সুরের আকশে ধ্রুবতারা সম
হয়েছিল তোমার উদয়।-
সুরের লহরী তুলি অপূর্ব সুন্দর
শুনাইলে সারা বিশ্বময়।
রবীন্দ্র সুকান্তের গীতি
কবির কাব্যগাথা,
তোমার মধুর সুরের পরশে
পেল যে সজীবতা।
সবারে বাসিলে ভাল
নিজ সহোদর জ্ঞানে,
শুনালে সাম্যের গান
বিশ্ববাসীর কানে।
মহান শিল্পী সুরের সাধক
এই তব পরিচয়,
সুরের জগতে হেমন্ত নাম
রবে চির অক্ষয়।
নয়ন সমুখে আজ তুমি নাই
ওগো সুরদাস কবি,
এঁকে দিয়ে গেছ নিখিল নয়নে
বিষাদকরুণ ছবি।
সুরের গুরু যেখানেই থাক
চরণে জানাই প্রণাম,
তোমার আশীষে ধন্য হোক
তৃষিত মোদের প্রাণ।

‘আনন্দ’ পত্রিকার সহ-সভাপতি প্রয়াত দেবব্রত চক্রবর্ত্তীর উদ্দেশ্যে (স্মরণ সভায় পঠিত)

হে বন্ধু,

অল্প কদিনের হয়েছিল পরিচয়,
আঁকার আসরে কিম্বা সাহিত্যবাসরে
দেখালাপ অল্প হলেও ছিল কিছু
প্রেম ভালাবাসা হৃদয় গভীরে।
তোমার সাহিত্যানুরাগ কাব্যপ্রীতি
‘আনন্দ’ সাহিত্যাসরের প্রতি নিষ্ঠা,
স্বল্পবাক হাসিখুশী
সবার সাথে মেশামিশি
ছিলে বিরল গুণের অধিকারী
ছোট গল্পের স্রষ্টা।
তাই তোমার স্মরণ সভায়
তোমাকে মনে করে
আজ ব্যথা পাই হৃদয় গভীরে।
আমারও যাবার সময় আসে ধীরে
হবেই হবে বা দেখা মনে লয় বারে বারে
যদি কভু হয় দেখা, হাসি মুখে
দুহাত বাড়ায়ে টানি নিও বুকে
সেই আশা অন্তরে রবে
যতদিন রহিব এ ভবে।
বেশী আয়ু বেশী অভিশাপ
সহিতে হয় বড় বিচ্ছেদের চাপ।
কর্মশেষে চলে যাব সেই কামনীয়।
তোমার যাত্রার মত চির বরণীয়।
যেখানেই থাকো বন্ধু শান্তিতে থেকো,
ফেলে যাওয়া প্রিয়জনে স্মরণেতে রেখো।

জাগলার অভয় মিত্রকে

সবাই বলে লাঠিদা
গোঁপ নেই দেয় তা
কান আছে শোনে কম
প্রিয় তার লস্যি,
দড়িদড়া তলোয়ার
নিয়ে খেলে চিরকাল
রাগালেও রাগেনাকো
একগুঁয়ে দস্যি।
জাগলার লাঠিদার
লাঠি নিয়ে কারবার
পাঁচজোড়া ডিস্ তার
ঘোরে যেন চরকী,
টুপিগুলো উড়ে উড়ে
শূন্যে ঘুরে ঘুরে
মাথায় আসে ফিরে
ঠিক্ যেন ভেলকী।
আমাদের লাঠিদার
দেশ জোড়া নাম তার
মাদার টেরেসার
পেল আশীর্বাণী,
কানা খোঁড়া দুঃস্থ
রোগী ও অসুস্থ
সকলের একান্ত
বন্ধু সে মানি।

কালবৈশাখী

গিয়াছে ফাগুন
গিয়াছে চৈত্র
ফুরায়েছে মধুমাস
এলো বৈশাখ
এসেছে জ্যৈষ্ঠ
তপন দহন ত্রাস।
রং-এর বাহার
নেই বনভূমে
পরেছে বিধবা সাজ,
বিটপীর শাখী
পেয়েছে পুরাতন
পাতা ঝরানোর কাজ
বাজিছে ডমরু
ডিমি ডিমি তালে
প্রলয়ঙ্কর সুরে,
ধিকি ধিকি বাড়ে
অগ্নির তাপ
নিদাঘ দ্বিপ্রহরে।
জ্বলে পুড়ে গেল
তৃণ তরুলতা
জ্বলছে ধূসর মাঠ,
যেন ঘৃতাহুতি পড়ে
বাড়ছে আগুন
জ্বলছে তামার টাট।
মাঠ ঘাট ফেটে
হল চৌচির

জলহীন হল জলাশয়,
ক্লান্ত পাখায় বিহঙ্গকুল
খোঁজে তরুশাখে আশ্রয়।
শ্রান্ত পথিক
খোঁজে ছায়াতল
জুড়াতে ক্লান্ত তনুমন,
মাঠ ছাড়ি যেথা
কাটিছে জাবর
গোঠের গাভীরা অনুখন।
প্রবল বেগে
বহিল পবন
জ্বলে অরণ্যে হুতাশন,
কোলাহল করে
আর্ত প্রাণীরা
কম্পিত করি সারাবন।
অগ্নি তাপে
তপ্ত দেহে
হিংস্র অহিংস পশুদল,
আত্মীয় সম
একসাথে মিলে
ত্যাজে অশান্ত বনতল।
হঠাৎ গগনে
ঘনঘটা করি
সঞ্চিত হ'ল কালোমেঘ,
হানিল বজ্র
উঠিল ঝঞ্ঝা
বাড়িল বায়ুর গতিবেগ।
বিটপী লতিকা
ছিল যতবনে

ধরিল দুহাত বাড়ায়ে
অশত্থ বটের
পেলব শাখা
পড়িল ভূতলে লুটায়ে
ভাঙ্গিল দেওয়াল
উড়ে গেল চাল
যত ছিল পর্ণকুটীর
তোলে কান্নার রোল
পল্লীবধূরা
মহাদুর্যোগে হ'য়ে অধীর।
ডমরু-পানির
জটা গেল খুলি
নামিল বৃষ্টিধারা,
শান্ত হ'ল
অরণ্য ভূমি
শীতল হ'ল ধরা।

বরষামঙ্গল

আজ শাওনের বাদল দিনে
মোরা মুখোমুখী বসিব দুজনে
কহিব না কিছু চুপে কানে কানে
নীরবে সঙ্গোপনে।

সব গান আজ হারায়েছে বাণী
পাতায় পাতায় তারি কানাকানি,
সূর্যমুখীর লজ্জা ঢেকেছে
মেঘের আস্তরণে।

মেঘ মেদুর নভপানে চাহি
তটিনীর জল কুলুকুলু গাহি
ছুটিয়া চলেছে সরমে রাঙ্গিয়া
নীল সায়রের পানে।

জলতরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া
ডাহুক ডাকিছে কোথা ওগো প্রিয়া
দুটি চকাচকি করে চোখাচোখি
দোঁহে দুজনার পানে।

ধূসর গগন বক্ষ চিরিয়া
বিজলী হানিছে রহিয়া রহিয়া
বিরহী যক্ষ জলদে ডাকিয়া
কি কহিছে কানে কানে।
আকাশ বাতাস নদী কল্লোল
মিলাইয়া সুর তুলিয়াছে রোল
নীরব ধরণী মুখর হয়েছে
মেঘ মল্লার গানে।

সব কিছু মাঝে তোমারই মহিমা
খুঁজে ফিরি তবু পাইনাকো সীমা
কি বিপুল টানে টানিছ সবারে
তাই ভাবি মনে মনে।
চেয়ে দেখি পাশে নেই সেথা প্রিয়া
হিয়ারে বেঁধেছি প্রেমরশি দিয়া
বিশ্বের সাথে সুর মিলাইয়া
নিভৃত নিরজনে।

শারদোৎসব

এলো এলো ওই বঙ্গজননী
শারদলক্ষ্মী সাজিয়া
পলাশ পদ্মে শোভিত কানন,
তার কাশবনে দোলে অঙ্গভূষণ,
অপূর্ব সেই রূপ অনুপম
জুড়াল নয়ন হেরিয়া।
মাঠ-ভরা ওই সোনার বরণ
গালিচা রেখেছো পাতিয়া।
নীল নভকোলে মেঘমালা দোলে
আপনার মনে কোথা ভেসে চলে
নীলাম্বরীর অঞ্চল পরে
হংস বলাকা রচিয়া।

নদী ভরা জল রূপ ঢলঢল
বহিছে দুকূল প্লাবিয়া,
মালতির মালা কণ্ঠে পরিয়া
শ্বেত শতদল বক্ষে ধরিয়া
মত্ত আবেগে ছুটিয়া চলেছে
খলখল হাসি হাসিয়া।
শারদ সাঁজে এ কোন সাজে
এলে অপরূপা সাজিয়া,
জ্যোছনার রঙে রাঙান বসন
তারায় খচিত অঙ্গ ভূষণ।
চন্দ্রমুখীর স্বর্ণচিকুর
ললাটে দিলো আঁকিয়া।
নিখিল বিশ্ব হইল নিঃস্ব
তোমার ওরূপ হেরিয়া।
আকাশ গাহিছে আগমনী গান
বাতাসে উঠেছে তারি কলতান
আমার পরাণ ভরিয়া আজিকে
সেই সুর ওঠে বাজিয়া।

।। হেমন্তোৎসব।।

(গান)

সূর্য তোমার সোনারোদ্দুর
ছড়িয়ে দিলে ধানের ক্ষেতে,
সোনার আলোয় সোনার ফসল
উঠল মেতে।
কুয়াসার ঘোমটা ঢেকে
ভোরের আলোয় তুমি এলে,
শিশির ভেজা নয়ন মেলে।
তোমার আসা-যাওয়ায় স্বপ্ন জাগায়
কোন সে মায়াতে
আজ ঝলমলিয়ে উঠল আলো
সোনার ধানক্ষেতে
সূর্য তোমার সোনার আলো
ছড়িয়ে দিলে কাশের বনে
ছড়িয়ে দিলে নদীর জলে
শিশির ভেজা আকুলপ্রাণে
আগমনীর গানখানি আজ গেছে থেমে
ফুলের বাহার নেইকো যে আর
শিরশিরে ওই হিমেল হাওয়া
কাঁপন আনে দেহে মনে
সূর্য তোমার সোনার কিরণ
ছড়িয়ে দিলে আজি এ প্রাতে।

'মন্থন'
নভেম্বর, ১৯৮৯

শীতঋতু

গেল হেমন্ত
এল শীত ঋতু
শুষ্ক রিক্তবেশে,
যেন কাঠিন্যে ভরা
দিগন্ত ব্যাপী
বিষাদের মূর্তি সে।
তার তাপ বিরল
রূপমূর্তি
মৌনী তপস্বীর,
পাতা ঝরানোর
ডাক পড়েছে
বিবর্ণ বনবিথীর।
ধান কাটা মাঠে
এসেছে নামিয়া
সীমাহীন শূন্যতা,
হিমেল হাওয়ায়
মলিন হয়েছে
সুললিত শ্যামলতা
তুষারপাতে
শীতল হাওয়ায়
উজল হল চন্দ্রকিরণ
শিশির সিক্ত
শিউলি পাতায়
দুলছে নোলক স্ফটিকবরণ

ইক্ষুরসের
মধুরবাসে
ভরল সবার মনপ্রাণ,
চাষীর ঘরে উঠল ফসল
সোনার বরণ শালিধান।
কৃষক বধূর
গৃহখানি আজ
উজল হল ধনধানে,
বনভূমি হ'ল
সুরমঞ্জিল
ক্রৌঞ্চ বধূর কলতানে
নূতন ফসল
উঠছে নিতি
শস্যভরা ক্ষিতি হোতে,
ভোজন বিলাসী
রসিক জনে
খুশীর জোয়ারে ওঠে মেতে।
এমনি তুহিন
তুষার উষায়
হিমেল হাওয়া গায়ে মেখে
ভ্রমণ পিয়াসী,
তীর্থযাত্রী
বিদেশ ভ্রমণ করে সুখে।

বসন্তোৎসব

ঝরাপাতার দিন শেষে
ফেলে রাঙ্গা চরণখানি,
ফুলের ডালি নিয়ে হাতে
এলে গো বসন্তরাণী।
ঘুমিয়েছিল মুকুলগুলি
শুকনো হিমের পরশ লেগে,
দখিন হাওয়ার বার্তা পেয়ে
নয়ন মেলে উঠল জেগে।
শ্যাম নীলিমার ঘটল মিলন
বনবীথির বাসরঘরে,
রং এর মেলা হাতছানি দেয়
প্রজাপতি মধুপেরে।
পদ্মপলাশ আবির ছড়ায়
তোমার সবুজ আঁচলটিতে,
হোলিখেলার রংএর নেশায়
ওরা বুঝি উঠল মেতে।
ভ্রমরা অলি নূপুর বাজায়
গাইছে কুহু মধুর স্বরে,
'বউ কথা কও' তান ধরেছে
তোমার ওই জলসাঘরে।
ওপার থেকে আসছে ভেসে
মেঘেরা শ্বেত ওড়না পরে,
বসন্তের এই মহোৎসবে
নেবে তোমায় বরণ করে।

ভক্তিগীতি

— ভগবান রামকৃষ্ণের গান —

দ্বাপরেতে কৃষ্ণ যিনি ত্রেতা যুগে রাম,
কলি যুগে রামকৃষ্ণ শ্রী ভগবান।
যবে হিংসা দ্বেষ কাম-কলুষ হয় ধরাধাম,
নররূপে আসেন প্রভু করিবারে ত্রাণ।
কামারপুকুর আর মথুরা বৃন্দাবন
যাঁর শ্রীচরণ স্পর্শে হল ব্রজের কানন।
কলিতে একটি নাম রামকৃষ্ণ রাম,
মনে জপ মুখে বল জয় জয়রাম।
যে নাম করিয়া জপ দস্যু রত্নাকর
মনুষ্যজনম হোতে পেল পরিত্রাণ।
ধন্য জয়রামবাটি মায়ের জন্মস্থান,
শ্রীচরণস্পর্শে যাঁর হ'ল স্বর্গধাম।
অঙ্গে মাখো ধূলি তার ধন্য করো প্রাণ
মায়ের আশীষে পূর্ণ হবে মনস্কাম।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ যিনি ত্রেতা যুগে রাম।

।। শ্যামা বিষয়ক ।।

স্বরবর্ণে শ্যামা সঙ্গীত

অসুর নাশিনী অভয়া মা কালী
আমার আমিত্বে দাও গো মা বলি
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
ঈশ্বরী মুণ্ডমালী।
উৎসবে ব্যসনে মাগো জীবন সন্ধ্যায়
ঊর্দ্ধে নিম্নে এ ব্রহ্মাণ্ডে থাকি মা যেথায়
ঋণগ্রস্ত সন্তানেরে দিও ঠাঁই পায়,
এটুকু রেখো মা দয়া ওগো ভদ্রকালী।
ঐ যে শমন আসে, তারেও না ডরি
ওমা অভয়পদে এ প্রাণ যদি সঁপে দিতে পারি
ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কারে দিয়ে জলাঞ্জলি।
অসুর নাশিনী অভয়া মা কালী।

।। শ্যামা সঙ্গীত ।।

তোর সাথে মোর নিত্য বিরোধ
হয় কেন তুই বল না।
আমি অভাবের ঘরে থাকি
ভাব তো আমার সয়না।
আমি এক ভবঘুরে
সারাদিন বেড়াই ঘুরে,
সবখানে মোর যাওয়াআসা
তবু তোর কাছে ত যাই না।
যদি দয়া করে না দিস দেখা
থাকব আমি একা একা
মায়ে পোয়ে মিটবে বিরোধ
কেমন করে বলনা।

।। শ্যামা সঙ্গীত।।

তোর কালরূপে ভুবন আলো
সে কথা কে না জানে,
নয়ন ভরে দেখব ও রূপ
একবার দেখা দে মা সন্তানে।
ধূলায় ফেলে অবোধ ছেলে
লুকালি মা কোনখানে,
খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে
ঘুরিস্ শ্মশান মশানে।
কেমন করে ডাকলে মাগো
আবার তুই নিবি কোলে,
কোন অপরাধে অপরাধী আমি
সে কথা দে মা বলে
জঠর জ্বালা মেটেও যদি
কালী নাম সুধাপানে,
প্রাণের তৃষ্ণা মিটবে কি মা
ও রাঙ্গাচরণ অদর্শনে?
সন্তানের অপরাধ কি
মা কভু রাখে মনে,
ক্ষমা দিয়ে ধুইয়ে দে মা
দয়া কি তোর নেই মা প্রাণে।

।। শ্যামা সঙ্গীত।।

হৃদয় ভরে ডাক দেখি মন
কালী কালী কালী বলে,
চরণ দুটি ধুইয়ে দে মার
ভক্তি প্রেমের অশ্রুজলে।
ভক্তি কমল যার ফুটেছে
তার কি প্রয়োজন গঙ্গাজলে,
জ্ঞানশচক্ষু যার খুলেছে
সে কি থাকতে পারে মাকে ভুলে
ষড়রিপু আঁকড়ে ধরে
কামনা বাসনা মেলি,
সারাজীবন ভজন পূজন
করে কি মার দেখা পেলি।
তাই বলি মন আসছে শমন
ভুলে যা বিষয় রতন,
মার চরণ দুটি বক্ষে ধরে
ডেকে ওঠ মা মা বলে
দেখি কেমন করে থাকে বেটি
অবোধ সন্তানেরে ফেলে।

মুক্তি মেলে ক'জনার

অসুখ ত সবার করে
কারও বা অসুখ সারে না,
অন্ন ত সকলেই খায়
কারও বা পেট ভরে না
বই ত সবাই পড়ে
বিদ্যা সবার হয় না।
রাতে ত সকলেই ঘুমায়
কারও চোখে ঘুম আসে না,
বুদ্ধি ত সকলের আছে
কারও বুদ্ধি খোলে না,
মান ত সবার আছে
অপমান কেউ ভোলে না।
দাঁতে বিষ সবার আছে
কেউ বা ফণা তোলে না,
আঘাত ত সকলেই খায়
তবু কেউ বা আঘাত হানে না
ভক্ত ত অনেক আছে
ভক্তি সবার থাকে না,
ঈশ্বরকে ত সবাই ডাকে
মুক্তি মেলে ক'জনার।

কবীরের দোঁহা অবলম্বনে

(১)

আমার ঈশ্বর অপার লীলাময়
যোগমুদ্রায় যোগী জানবে কেমনে?
ধর্মের ব্যাপারী ঘুরছে জগৎময়
ব্রহ্মচারী ডুবে আছে পূজা তর্পণে।
এ পৃথিবীর বায়ু না করে গ্রহণ
যোগী কুম্ভক প্রক্রিয়ায় করে জীবনধারণ,
অজগর সর্পসম শক্তি লভিয়া
এ বিশ্ব খেলায় বাজী হারে অনুখন।
আমার মনমন্দির রহে যে শূন্য
রজনী হেন ঘন অন্ধকার
তবে কোথা বিশ্রাম লভিবে এভক্ত
কোথা সে শান্তির বিশ্রামাগার।
কবীর কহেন —
'শুন ভাই সাধো, করহ বিশ্রাম,
রবি শশী যে মন্দিরে রহে দীপ্যমান।

কবীরের দোঁহা অবলম্বনে

(২)

এই দুনিয়া পাগলের কারখানা,
সত্য কহিলে সবাই করবে তোমায় ভর্ৎসনা।
হিন্দু বলে রাম উপাস্য মুসলমান বলে রহিম
রাম রহিম যে একই ব্রহ্ম জানে কি হিন্দু মুসলিম?
পরস্পরে লড়াই করে মর্ম কথা না বুঝে।
কেহ পূজে কোরাণ কেহ মরে পাথর খুঁজে।
কেহ মাথায় রাখে টিকি কেহ লম্বা দাড়ি,
কেহ মাথায় লাগায় টুপী কেহ হয় জটাধারী।
কেহ বা মূর্তি পূজে তীর্থব্রত করে পালন,
কেহ কপালে তিলক আঁকে কেহ করে মাল্যধারণ।
কেহ দোঁহা পাঠ করে কেহ করে ভজন গান,
ওরা মিথ্যা পথের অন্ধযোগী জানেনা কে ভগবান।
পীর ফকির অনেকেই আছে
পড়ে কোরাণ অথবা গ্রন্থ
শিষ্যেরে শেখায় গুপ্তবাক্য
নিজেরা জানেনা কোন্‌টি সত্য।
কেহ মিথ্যা অভিমানে মত্ত
ঘরে ঘরে করেন মন্ত্রদান,
অন্তিমকালে হয়ে অনুতপ্ত
শিষ্যের সাথে রসাতলে যান।



।। পরিশিষ্ট।।

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির মতে সমগ্র গীতার প্রকৃত মর্মার্থ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েই নিহিত আছে। তাঁদের মতে দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করা মানেই সমগ্র গীতা পাঠ করা। অনেকেই প্রত্যহ গীতা পাঠ করেন কিন্তু সমগ্র গীতা প্রত্যহ পাঠ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষায়। তাঁদের কথা চিন্তা করে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকগুলি বাংলায় তর্জমা করে পদ্যছন্দে পরিবেশন করা হল। পাঠক পাঠিকাবৃন্দ উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা

(দ্বিতীয় অধ্যায় — সাংখ্যযোগ)

১ম। সঞ্জয় বলিলেন —
অর্জুনের অশ্রুপূর্ণ বিরস বদন
হেরিয়া তাঁহারে কন শ্রীমধুসূদন।

২য়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,
কিভাবে অর্জুন তুমি ঘোর সঙ্কটকালে,
নিন্দনীয় অনার্যের ভাবেতে মজিলে।।

৩য়। ক্লীবভাব তব কভু নাহি শোভা পায়
যুদ্ধার্থে ওঠো সখা ক্ষত্রিয়ের প্রায়

৪র্থ। অর্জুন বলিলেন —
অর্জুন জিজ্ঞাসিল শক্রমর্দন শ্রীমধুসূদনে
অতি পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণাচার্যসহ
বাণযুদ্ধ করিব কেমনে তা' কহ?

৫ম। মহানুভব গুরুজনে না করিয়া বধ
ভিক্ষান্ন গ্রহণে পুণ্য হবে এ জগতে,
গুরু বধি লাভ কিবা লভি রাজ্যপদ
রুধিরসিক্ত ভোজ্যআদি হইবে ভুঞ্জিতে।।

৬ষ্ঠ। যুদ্ধে জয় কিম্বা যদি হয় পরাজয়
হেয় বা শ্রেয় কোনটি বোধগম্য নয়।
যাদের বিনাশ করি বাঁচিতে না চাই,
সম্মুখে রয়েছে তারা বন্ধু জ্ঞাতি ভাই।

৭ম দৈন্যতায় মূঢ় আমি নাহি ধর্মজ্ঞান
যাহা শ্রেয় কহ হরি সে কর্মের বিধান।
পদাশ্রিত শরণাগত দীন শিষ্য আমি
মঙ্গলকর যাহা বল প্রভু শুনি তব বাণী।।

৮ম। শত্রুহীন রাজ্যের যদি হই অধীশ্বর
কিম্বা ইন্দ্রত্ব লভি সবার উপর
তাহে কি মিলিবে শান্তি আমার এ শোকে?
এমন উপায় কোন আছে কি ত্রিলোকে?

৯ম। সঞ্জয় বলিলেনঃ
হেন কথা অর্জুন কহিয়া কেশবে
'যুদ্ধ করিব না', বলি রহিল নীরবে।

১০ম। সৈন্যমাঝে বিষাদময় হেরিয়া অর্জুনে
কহিলেন নারায়ণ সহাস্য বদনে।

১১শ। শ্রীভগবান কহিলেন ঃ
যাহাদের শোকে তুমি ও ম্রিয়মান,
উচিত কি হয় তব হ'য়ে জ্ঞানবান?
বিজ্ঞসম জ্ঞানবাক্য কহিলে সকল।
অজ্ঞসম শোকেমগ্ন হ'য়ে কিবা ফল?
পন্ডিত যে জন হয় শোক নাহি তার
মৃত কিম্বা জীবিতের করে না বিচার।

১২শ। তুমি আমি যত রাজা সম্মুখে তোমার,
পূর্বে ছিল না কেহ পরে না থাকিবে
এ বিচার শুধুমাত্র অজ্ঞ জনার
জ্ঞানীগণ এ বিচার কভু না মানিবে।।

১৩শ। দেহের শৈশব আছে, আছে যৌবন
বার্ধক্যের পরে আসে নিশ্চিত মরণ।
এগুলি দেহের শুধু অবস্থান্তর,
অবিকৃত রহে দেহী হলে দেহান্তর।
এই জ্ঞান লভি যতজ্ঞানীগুণীগণ
থাকেন অবিচল কভু মোহান্ধ না হন।

১৪শ। ইন্দ্রিয় সংযোগ হলে বিষয় বৈভবে,
শীতোষ্ণ দুঃখ সুখ অনুভূত হবে।
ইহারা অনিত্য সব কহে গুণীগণ
হর্ষ বিষাদ ত্যজি সহ অনুক্ষণ।

১৫শ। শীতাতপে যেইজনে রহে অকাতর,
দুঃখে সুখে রহে স্থির যাহার অন্তর,
জীবনে মরণে যেবা থাকে নির্বিকার
সেই ত' সন্তান অমৃতের।

১৬শ। অসৎ যা কিছু আছে তার আছে লয়
সৎ অবিনাশী, চির অক্ষয়
নিত্য অনিত্য করিয়া বিচার
সন্ধান কর বীর চির সত্যের

১৭শ। অখণ্ড মন্ডলাকারে
ব্যাপ্ত আছেন যিনি এই চরাচরে
বিনাশ নাহিক যাঁর ত্রিসংসারে
তিনিই সত্য জানিবে স্থির।

১৮শ। আত্মা অবিনাশী চির অক্ষয়।
কিন্তু দেহের আছে উৎপত্তি বিলয়
এই সত্যজ্ঞানে না করি সংশয়
ক্ষাত্রধর্ম্ম যুদ্ধ কর হে বীর।

১৯শ। আত্মা কখনও করে না সংহার
দেহী কভু হয় না হত,
এ সত্যের যেবা করে বিচার,
সত্যের স্বরূপ তার নহে অধিগত।

২০শ। নাহিক জন্ম নাহিক মৃত্যু
হ্রাসবৃদ্ধি কভু নাহি আত্মার,
হন্তা বা হত হ'ন নাক তিনি
নিত্য শাশ্বত নির্বিকার।

২১শ। আত্মা, যাঁর নাইকো বিনাশ
নিত্য, অজ, অব্যয় যিনি,
কাহাকে তিনি করান হত্যা
কেমনে হত্যা করেন তিনি?

২২শ। ছিন্ন বসন ত্যাজিয়া যেমন
নব পরিধান ধারয়ে নর,
জীর্ণ শরীর ত্যাজিয়া আত্মা
গ্রহণ করে নব কলেবর।

২৩শ। শস্ত্র পারে না ছেদিতে ইহারে
অগ্নি পারে না দহিতে,
আর্দ্র করিতে পারে না সলিল
পারে না মরুতে শোষিতে।

২৪শ। অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য
মহান আত্মার ইহাই মর্ম
সর্ব্বব্যাপী ইনি স্থির, নিশ্চল,
নিত্য, সনাতন তাঁরই ধর্ম্ম।

২৫শ। আত্মার স্বরূপ চিন্তার অতীত
বর্ণিতে বাক্য পারে কদাচিৎ
তিনি নির্বিকার জেনে এ তত্ত্ব
শোকে ম্রিয়মান হয়ো না ক্বচিত।

২৬শ। দেহের সাথে দেহীর জনম্
মৃত্যুতে তার অবসান,
এরূপ ভাবনা ভাবিয়া, হে বীর!
শোকে হয়োনাকো ম্রিয়মান।

২৭শ। জনম হইলে হইবে মরণ
মরণের পরে পুনর্জ্জনম,
বিধির বিধান অপরিহার্য
শোকাকুল এবে না হবে ধরম্।

২৮শ। দেহ দৃষ্ট হয় জনমের পর
থাকে তাহা অপ্রকাশ
পুনঃ লয় হয় মরণের পর
তবে কেন বৃথা হও হতাশ।

২৯শ। কেহ আশ্চর্যরূপে দেখে আত্মাকে
বর্ণনা করে কেহ আশ্চর্য রূপেতে
কেহ শ্রবণ করে আশ্চর্য ভাবেতে
তবু আত্মার স্বরূপ কেহ
না পারে বুঝিতে।

৩০শ। দেহীর বাস দেহের মাঝে
অবধ্য সে — তার নাহিক মরণ
জীবের শরীর সদা বিনাশী
মৃত্যুতে তার শোক অকারণ।

৩১শ। স্বধর্ম্ম পালিতে তব
ভয় কেন চিতে
ধর্মযুদ্ধ শ্রেষ্ঠ ধর্ম
ক্ষত্রিয়ের এ জগতে।

৩২শ। স্বর্গের প্রবেশদ্বার পেলে উন্মুক্ত
নিজেকে সকলে ভাবে মহাভাগ্যবান
এমনি ধর্মযুদ্ধ লভি এই ভবে
সমভাগ্যবান হয় ক্ষত্রিয় সন্তান।

৩৩শ। যুদ্ধ পরিহরি তুমি
যদি হও ধর্মত্যাগী
স্বধর্ম স্বকীর্তি ত্যজি
হবে প্রত্যবায়ভাগী।
৩৪শ। তোমার অপযশ গাহি
লোকে দেবে ধিক্,
সম্মানিতের সে যাতনা
মৃত্যুর অধিক।
৩৫শ। কর্ণাদি মহারথীগণ
ভাবিবে সকলে
যুদ্ধভয়ে ভীত তুমি
রণে ভঙ্গ দিলে
যাদের চক্ষে তুমি
ছিলে সম্মানীয়
তাহারা জানিবে এবে
তুমি অতি হেয়।
৩৬শ। নিন্দিবে শত্রুগণ সবে
তব বীরত্বে দিয়া কালি
কেমনে সহিবে তাহা
আত্মজ্ঞান ভুলি।
নিজ কর্ণে নিজ নিন্দা
শুনি রবে নীরবে,
তদপেক্ষা দুঃখকর
কি বা আছে ভবে?
৩৭শ। যুদ্ধে হইলে হত
স্বর্গলাভ হবে,
জয়ী হলে রাজ্য সুখ
অবশ্য লভিবে।
তবে কেন হও সখা
যুদ্ধে বিরত,
ওঠ, নিয়ে দৃঢ়কল্প
যুদ্ধে হও রত।
৩৮শ। সুখ দুঃখ লাভালাভ জয়পরাজয়
সমতুল্য জ্ঞান করি যুদ্ধে হও রত

ধর্মযুদ্ধে হত্যা কোন পাপকর্ম নয়
(তবে) পাপবোধে মন কেন করিছ পীড়িত।

৩৯শ। আত্মার তত্ত্বজ্ঞান শুনিলে এতক্ষণ,
নিষ্কাম কর্মযোগ কহিব এখন
নিষ্কাম কর্মের জ্ঞান লভিলে রাজন
সংসার বন্ধন হ'তে মুক্তি পাবে মন।।

৪০শ। কর্মযোগের ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানও
ব্যর্থ না হয় কভু এই সংসারে,
স্বল্পমাত্র ফলও যদি হয় লাভ কারও
জন্মমৃত্যু ভয় তার যাবে চিরতরে।।

৪১শ। নিষ্কাম কর্মীর চিন্তা একনিষ্ঠ হয়
অনন্ত সকাম বুদ্ধি বহু শাখাময়।

৪২-৪৩শ। শুনহ পার্থ! অবিবেকী নরগণ,
শুধু বেদের ক্রিয়াকাণ্ডে আস্থাভাজন।
বেদের বাদানুবাদে সদাই ব্যাপৃত
মধুর বচনে তারা কহে অবিরত —
ভোগৈশ্বর্য স্বর্গসুখ মিলিবে সকল,
বেদের কর্মানুষ্ঠানের নিশ্চিত ফল।

৪৪শ। ভোগের পুষ্পিত বাক্যে বিমুগ্ধ যে জন,
শাস্ত্রোক্ত প্রজ্ঞা তার হয় না কখন।

৪৫শ। বেদের কর্মকাণ্ডে হয়
কামনার প্রকাশ
এবে পরিহার কর পার্থ
কর্ম্মফল আশ।
হও সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বরহিত
সত্ত্বগুণাশ্রিত
যোগক্ষেম শূন্য হও
হও অপ্রমত্ত।

৪৬শ। বৃহৎ বারিধি যদি রয় চারিপাশে,
তুচ্ছ কূপের জলে কিবা প্রয়োজন।
তথা বেদের কর্ম কেহ সাধিবে কোন আশে,
ব্রহ্মজ্ঞান লভিয়াছে ভবে যেইজন।

৪৭শ। তুমি কর্মের অধিকারী শুধু
ফলের কভু নয়,

যেন ফলহেতু কর্মনাশে
প্রবৃত্তি না হয়।

৪৮শ। সিদ্ধ্যসিদ্ধে সমভাবে
ভরিয়া চিত্ত,
যোগযুক্ত নিষ্কাম কর্মে
হও প্রবৃত্ত।

৪৯শ। কাম্যকর্ম নিষ্কাম হ'তে
নীচ জ্ঞানে পার্থ,
কামনা ত্যজিয়া লহ
সমত্বের আশ্রয়
কর্মফলে লিপ্সা যার
সে অপদার্থ
হীন অতি জেনো তারে
না রেখো সংশয়।

৫০শ। নিষ্কাম কর্মযোগী ইহজীবনেই
পাপ এবং পুণ্য হতে পায় পরিত্রাণ,
সমভাব যুক্ত হয়ে সুকৌশলে
নিষ্কাম কর্মযোগের কর অনুষ্ঠান।

৫১শ। নিষ্কাম কর্মে যুক্ত মনীষীগণ,
লভে মোক্ষ ছিন্ন করি কর্মের বন্ধন।

৫২শ। কর্ম-যোগে মোহমুক্ত
হ'লে তব মন,
শ্রুতির ফললাভে লোভ
রবে সংবরণ।

৫৩শ। কর্মযোগের নানা ফল করিয়া শ্রবণ,
স্থির যদি হয় তব চিত্ত তখন,
ব্রহ্ম সমাধিতে মন করে অবস্থান
তত্ত্বজ্ঞান লভি তুমি হবে পুণ্যবান।

৫৪শ। অর্জুন বলিলেন
শ্রীকৃষ্ণে ডাকিয়া এবে কহেন অর্জুন
সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের কি হয় লক্ষণ,
কেমন অবস্থিতি তাঁর কিরূপ বাচন,
কিরূপভাবে তিনি করেন বিচরণ

৫৫শ। শ্রীভগবান বলিলেন

অর্জুনকে সম্বোধিয়া ভগবান তখন,
স্থিতপ্রজ্ঞ বাক্যের অর্থ করেন বিশ্লেষণ।
কামনা বাসনা লোভ করি সম্বরণ,
বাহ্যবস্তু লভে যিনি নিরপেক্ষ হন,
আত্মায় আত্মস্থ যিনি তদ্‌গত মনা
অবশ্যই স্থিতপ্রজ্ঞ জানিবে সে জনা।

৫৬শ। দুঃখে অবিচল যিনি সুখে স্পৃহাহীন,
আসক্তিতে মন যাঁর হয় না মলিন,
ক্রোধ অপ্রকাশ যাঁর ভয়ে নন ভীত
সেই যোগী স্থিতপ্রজ্ঞ নামে হন খ্যাত।

৫৭শ। সৎ অসৎ শুভাশুভ কিম্বা লাভালাভে,
গ্রহণ করেন যিনি নিরাসক্তভাবে
প্রজ্ঞা তাঁর প্রতিষ্ঠিত যেন সুনিশ্চয়,
যদি তাঁর বাহ্য ইন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত হয়।

৫৮শ। কূর্ম যেমন ভীত হলে প্রবিষ্ঠ করে
হস্ত, পদ, মস্তকাদি দেহের ভিতরে।

৫৯শ। ইন্দ্রিয় সুখ বিবর্জিত আতুর যে জন
ইন্দ্রিয় সুখ যদিও তার হয় নিরসণ
বিষয়াসক্তি অন্তরেতে রয় অনুক্ষণ
যদ্যপি না ঈশ্বরের পায় দরশণ।

৬০শ। কুন্তীপুত্রে সম্বোধিয়া কহেন ভগবান।
বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ অতি বলবান।
যত্নশীল শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষেরও মন
সদর্পে বিষয়াভিমুখে করে আকর্ষণ।

৬১শ। ইন্দ্রিয় সংযত করি যিনি আত্মায় আত্মস্থ,
সে যোগীর আত্মজ্ঞান জেনো প্রতিষ্ঠিত।

৬২-৬৩শ। বিষয় চিন্তায় হয় কামনার উদয়,
অপূর্ণ কামনায় চিত্ত ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়,
ক্রোধে মোহ, মোহে ভ্রম, ভ্রমে বুদ্ধিনাশ,
নির্বোধের সৎবুদ্ধির হয় না বিকাশ।

৬৪-৬৫শ। সৎ বস্তু লাভে তৃপ্ত হয় যার মন,
বিচারে অসৎ যাহা করিয়া বর্জন,
সর্ব দুঃখ নাশিবে তার প্রসন্নতা লাভে
অচিরেই প্রজ্ঞা তার নিশ্চল হবে।

৬৬শ। আত্মস্বরূপিনী বুদ্ধি যার নাহি সমাহিত,
বিষয়ে অন্তর তার সদাই প্রমত্ত।
বিষয় কামনাযুক্ত বিষয়ীর মনে,
অশান্ত হৃদে সুখ সে লভিবে কেমনে।

৬৭শ। তটিনীর বক্ষ হতে তরীকে যেমন,
নিয়ে যায় উন্মার্গে দুরন্ত পবন।
তদ্রূপ প্রবল কোন ইন্দ্রিয়ের তাড়ন,
নরের বিবেকবুদ্ধি করে অপহরণ।

৬৮শ। ইন্দ্রিয় সংযত যার, জেনো মহাবীর
এ সংসারে প্রজ্ঞা তার রয় চিরস্থির।

৬৯শ। অজ্ঞানের পক্ষে নিশা অন্ধকারময়,
জিতেন্দ্রিয় দেখে তারে সর্বব্রহ্মময়।
অজ্ঞান স্বরূপ রাতে জীবগণ রহে বদ্ধ
সংসারের মাঝে,
সংসারে বীতরাগ ব্রহ্মজ্ঞানী যোগী তাহে
নিশা জ্ঞানে ত্যজে।

৭০শ। বহু বারি রাশি যথা প্রবেশি সাগরে
স্ফীত না করিতে পারে সাগরের জল
তদ্রূপ জানিবে প্রাজ্ঞ নরের অন্তরে
লুপ্ত হয় কামনার বস্তু সকল।
কামনার মোহে মুগ্ধ রহে যার মন
শান্তি লাভ কভু নহে করে সেইজন।

৭১শ। মমত্বহীন নিষ্কাম নিরহঙ্কারী যে জন
নিস্পৃহভাবে যিনি করেন বিচরণ,
ব্রহ্মজ্ঞান লভি যিনি অহঙ্কার মুক্ত,
শান্তিলাভ শুধুমাত্র তাঁরই অধিগত।

৭২শ। ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ কভু হইলে মনেতে,
মন তাঁর মোহগ্রস্ত হবে না কোনমতে।
শুন পার্থ! স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানবান অতি,
ব্রহ্মলাভ হয় অন্তে নির্বাণ তাঁর গতি।।

যোগশাস্ত্রে শ্রী কৃষ্ণার্জুন সংবাদে
সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।